আমাদের সময়

তারিখ 20 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি পিছিয়েছে বাংলায়

এম এইচ রবিন ●

গত ১৬ বছরে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ। এ সময়ে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তির হার যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তের হারও। বেড়েছে শিক্ষার্থীদের শেখার যোগ্যতা। কমেছে ঝরে পড়ার হার। লৈঙ্গিক সমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিকে শিক্ষকদের যোগ্যতা বেড়েছে। এত অর্জনের মধ্যেও মাতৃভাষা বাংলা শিখনে পিছিয়ে পড়ছে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা।

১০ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উত্তোলিত হয় না জাতীয় পতাকা

দেশের প্রাথমিক, কিন্ডারগার্টেন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর চালানো গবেষণার 'পর 'গণসাক্ষরতা অভিযান' প্রকাশিত 'এডুকেশন ওয়াচ ২০১৫' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ চিত্র ফুটে উঠেছে। গতকাল শনিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মিলনায়তনে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ সময় ১৯৯৮ সাল থেকে করা গণসাক্ষরতা অভিযানের আগের প্রতিবেদনগুলোর সঙ্গে বর্তমান প্রতিবেদনের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণও তুলে ধরা হয়।

প্রতিবেদনটির বিষয়ভিত্তিক শিখনে অভীক্ষা প্রশ্নে দেখা যায়, প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা বাংলায় পিছিয়ে যাচ্ছে। ২০১৪ সালের গবেষণায় উঠে এসেছে, শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিজ্ঞানে ৮৩.৩, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ে ৭৮.৭, বাংলায় ৭৩.৭, গণিতে ৬৯.২ ও ইংরেজিতে ৬২ শতাংশ যোগ্যতা অর্জন করেছে। ২০০৮ সালের তুলনায় গণিতে সবচেয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বেশি উন্নতি হয়েছে– ২১.২ শতাংশ। এরপর ইংরেজিতে ১৫ এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ে ১৫ শতাংশ। কিন্তু বাংলা বিষয়ে উন্নতি হয়েছে সবচেয়ে কম, মাত্র ৭ শতাংশ।

দেশে এখন ১০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না। জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না ২৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে। এ বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত গাওয়ার ক্ষেত্রে ২০১৪ সালে গবেষণার দিন ৯০ শতাংশ বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং ৭৭ শতাংশে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন ছিল ৯৫ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ৭২.৭ শতাংশ এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসা ৮১.৩ শতাংশ। এ হিসাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ২৭.৩ শতাংশ এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসায় ১৮.৭ শতাংশে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না।

বিদ্যালয়ে প্রতিদিন শরীরচর্চা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্লাব কার্যক্রম সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় এসেছে, ৪১ শতাংশ বিদ্যালয়ে এসব সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম হয় না।

বিদ্যালয়ে ভর্তি ও ঝরে পড়া সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৩-১৪ সালে যেসব শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে ৮৬.৮ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত টিকে ছিল। ৭৯.২ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে। অর্থাৎ প্রায় ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা পূর্ণ করার আগেই ঝরে পড়ছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী বিদ্যালয়বহির্ভূত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৮ সালে ৬-১০ বছর বয়সী ৩৮ লাখ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে ছিল। এই সংখ্যা কমে ২০০০ সালে ৩৪ লাখ ও ২০০৫ সালে ২৩ লাখ হয়, যা ২০০৮ সালে একই ছিল। বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা ২০১৩ সালে দাঁড়ায় ১০ লাখে। ১১-১৪ বছর বয়সীদের মধ্যেও বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা কমেছে। এই বয়সীদের মধ্যে ১৯৯৮-২০০০ সালে ছিল ৩৩ লাখ, যা ২০০৫ সালে কমে দাঁড়ায় ২৬ লাখে ও ২০১৩ সালে আরও কমে হয় ১৮ লাখ।

এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদন প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান জানান, প্রাথমিক শিক্ষা এগিয়ে যাচ্ছে, তারই প্রতিফলন ঘটেছে প্রতিবেদনে। তবে আমাদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। সেদিকে আরও মনোনিবেশ করতে হবে। অভিভাবকদের সচেতনতার কারণে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ব্যক্তি-পরিবার সচেতনতার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। দরিদ্র পরিবারও চেষ্টা করে তার শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে। এরপর সরকারও ঝরে পড়া কমাতে দুপুরে খাওয়া, টিফিন বিস্কুট বিতরণ উপবৃত্তি দিচ্ছে। যেখানে ৭৮ থেকে ৭৯ লাখ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতায় ছিল, এখন তা বাড়ানো হচ্ছে ১ কোটি ৩০ লাখে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা বাংলায় পিছিয়ে পড়ছে। এটা মোটেই সুখকর কোনো নির্দেশক নয়। আমরা ইংরেজি, গণিত আর বিজ্ঞানে বিশেষ জোর দিচ্ছি, অন্যদিকে বাংলায় পিছিয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীরা। এমনটা হওয়া উচিত নয়। কেন জানি মনে হচ্ছে, আমরা পার পাওয়ার শর্টকাট রাস্তা খুঁজছি। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে উচ্চশিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের স্বাধীনতার পর প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যার ফল আমরা পাচ্ছি। এখন প্রতিটি স্তরেই আমাদের আরও ভেবে দেখার সময় এসেছে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় আমাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। প্রাথমিকে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানে ভালো করছে শিক্ষার্থীরা। আমরা দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে শিক্ষার্থীরা সাধারণ ভগ্নাংশ করতে পারছে না। এখন লেখাপড়ার দুর্বলতম স্তর হচ্ছে মাধ্যমিক। আমাদের মানসম্পন্ন লেখাপড়ার দিকে এগোতে হবে। বিত্তবানদের মানসম্পন্ন লেখাপড়ার জন্য অনেক পথ রয়েছে। তার মতে, আগে দরিদ্রদের মানসম্পন্ন লেখাপড়া নিশ্চিত করতে হবে। তবেই আমাদের 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগান সার্থক হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, ১৯৯৮ সাল থেকে এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। এখানে কোন স্তরে আমরা কতটুকু করতে পেরেছি, আগামীতে আর কী চ্যালেঞ্জ আছে– সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। এই গবেষণা সরকারের পলিসিতে কাজে এলে সেটাই আমাদের সার্থকতা।

গণসাক্ষরতা অভিযানের গবেষক সমীর রঞ্জন নাথ বলেন, বিদ্যমান অগ্রগতির ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে ২০১৯ সালে গিয়ে শতভাগ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। শিক্ষকদের যোগ্যতা উন্নতির চিত্র তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৯৮ সালে যেখানে ৪৮.৩ শতাংশ শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক ডিগ্রি ছিল, ২০১৪ সালে তা ৫৭. ২ শতাংশ হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এই হার ৬৬.৯ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে ৬৩.৪ শতাংশ নারী শিক্ষক রয়েছেন। ১৬ বছর আগে এই হার ছিল ৩১ শতাংশ।